

# আমরা কি অসহিষ্ণু জাতিতে পরিনত হচ্ছি?

আ হ সা ন মো হা ম্ম দ

আমার একজন আইরিশ বন্ধু বলেছিল যে তাদের দেশে কেউ নাকি প্রথম পরিচয়ে কারো নাম বা সে কোন স্কুলে লেখাপড়া করেছে তা জানতে চায় না। জানতে চাইলে নাকি প্রাণ সংশয় হতে পারে। শুনে খুব অবাক হলে সে বলেছিল যে নাম কিংবা স্কুলের নাম থেকে বোঝা যায় যে সে ব্যক্তিটি ক্যাথলিক না প্রটেস্ট্যান্ট। দুইজন একই ধর্মের দুই মতের অনুসারী হলেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। ভাবতেও কষ্ট হয় যে খোদ যুক্তরাজ্যে একবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার পাশ্চাত্য দেশটির অবস্থা তো রীতিমত ভয়াবহ। সেখানে কিছু লোক সংখ্যালঘুদের উপানসালয় ভেঙ্গে সেখানে নিজেদের মন্দির বানানোর প্রতিদানে দেশটির জনগণ তাদেরকে শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছিল। ভিন্ন ধর্মের নাগরিকদেরকে গণহত্যা এই যুগেও সেখানে নিষ্ঠা নৈমিত্তিক ব্যাপার। বন্ধুর কথায় আমি জাত্যাভিমান লুকিয়ে রাখতে পারিনি। বলেছিলাম, বাংলাদেশে এ ধরনের পরিস্থিতি কল্পনাও করা যায় না। সাধারণ জনগণের কথা তো দূরে থাক, যাদেরকে আমরা মৌলবাদী বলি তাদের নেতারা পর্যন্ত হিন্দু ধর্মালম্বীদের পূজার সময়ে পূজা মন্ডপে ঘুরে ঘুরে নিশ্চিত করার চেষ্টা করেন যে তাদের ধর্ম পালনে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে না। তবে ধর্মের খোলসে অসহিষ্ণুতা আমাদের সমাজে প্রবেশ করতে না পারলেও সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাতে মনে হচ্ছে তা ভিন্ন দরজা খুঁজে পেয়েছে। সমাজের এমন একটি অংশ এই অসহিষ্ণুতায় আক্রান্ত হচ্ছে যাদেরকে জাতির ভবিষ্যৎ বলা হয়। এই অসহিষ্ণুতার কারণ অনুসন্ধান ও তার সমাধানের পথ খুঁজে দেখা প্রয়োজন যেন আগামী দিনের সমৃদ্ধ ও উদ্ভাসিত বাংলাদেশ গড়ার প্রক্রিয়া বর্ধিষ্ণু অসহিষ্ণুতার কারণে বিঘ্নিত হতে না পারে।

কয়েকমাস আগে সিলেটের একটি বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ঐ শহরেরই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আড্ডা দিতে আসে। মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের সাথে তাদের আচরণ নিয়ে সেখানকার ছাত্রদের সাথে তাদের কথা কাটাকাটি হয়। এই তুচ্ছ ঘটনাটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়, হতাহতের ঘটনা ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হয়। পদত্যাগের ঘটনাটিও ছিল ভয়াবহ। উপাচার্য যখন সপরিবারে তাঁর বাসভবনের দোতলায় অবস্থান করছিলেন তখন ছাত্রেরা তাঁর বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং ছাত্রদের সাথে গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ, পথচারীদের সংঘর্ষ ইত্যাদি হাজার রকমের সংঘর্ষ প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করে রাখছে।

সম্প্রতি এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে রাজধানীতে যাকে দলীয় ভাবনার উর্দে উঠে চিন্তা করলে উদ্বেগজনক না বলে উপায় থাকে না। কোন রকম বোধগম্য কারণ ছাড়াই তিনটি ছাত্র সংগঠনের নেতা, কর্মী ও সমর্থকেরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে ওঠে। ছাত্র সংগঠনগুলোর সংঘর্ষের পিছনে সাধারণতঃ অতি তুচ্ছ কারণ যেমন পোস্টার ছেড়া, দুদলের দুই সমর্থকের মধ্যে কথা কাটাকাটি, এক বিভাগের ছাত্রীর প্রতি অন্য বিভাগের ছাত্রের প্রেম নিবেদন ইত্যাদি থেকে থাকে। এ সংঘর্ষের পিছনে এ ধরনের কোন তুচ্ছ কারণও ছিল না। পত্র-পত্রিকার খবরে দেখা যায় যে রাজধানীর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্র সংগঠনের ছাত্ররা ক্যাম্পাসে সমবেত হচ্ছে এ সংবাদে অন্য কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী সমর্থকেরা তাদের উপর হামলা চালায়। যাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে তাদের সমর্থক সন্দেহে অনেক ছাত্রকে

ছাত্রাবাসের কক্ষ, এমনকি টয়লেটের ভিতর থেকে টেনে এনে পেটানো হয়। যেহেতু হামলাকারীদের একাংশ ছিল সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন, তাই পুলিশও তাদের সাথে এ বর্বরতায় অংশ নেয়। বিষয়টি কয়েকদিন ধরে পত্র-পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের খবরের শিরোনাম হয়েছিল। হামলার কারণ হিসাবে হামলাকারীরা বলেছিল যে সংগঠনটি রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিষিদ্ধ।

এই বিষয়টি নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার ছাড়া অন্য কেউ কি কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকে কোন স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারে? প্রশ্ন উঠছে যে আমরা কি একটি উদার গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করছি নাকি বাংলাভাই শাসিত বাগমারাতে রয়েছি যেখানে যাকে ইচ্ছা নিষিদ্ধ করা যায়, পেটানো যায় এবং চাইলে হত্যা করে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা যায়? তবে আরও কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টি হচ্ছে নিষিদ্ধ ঘোষণার কারণ। কেন ছাত্রদের একটি দলকে রাজধানীতে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে তা কেউ খোলসা করে বলেনি। আকারে ইঙ্গিতে কেউ কেউ বলেছেন যে উক্ত দলটিকে কর্মকাণ্ড চালাতে দিলে তারা শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কলুষিত করবে। শিক্ষাঙ্গনের যে পরিবেশ বর্তমানে রয়েছে তাকে আরও কলুষিত কিভাবে করবে? চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদিতে নিষিদ্ধকারীরা কি কম পারদর্শী। এমন কোন দিন খুব কমই যায় যেদিন নিষিদ্ধকারী ছাত্র সংগঠনগুলোর সোনার ছেলেরা এ সকল অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে। বর্তমানের সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন বড় মাপের নেতা সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ডদেশ পেয়েছে চিতা নামক এলিট ফোর্সের সদস্যকে হত্যা করে স্বর্ণের দোকান লুটের কারণে। বিরোধী দলের একজন ছাত্র নেতা গত সরকারের সময়ে দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে ধর্ষণের সেধুরী প্রকাশ্যে ও সড়াস্বরে উদযাপন করেছিল। নিষিদ্ধকৃত সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা এ সকল কাজে কি তাদের থেকেও পারদর্শীতা অর্জন করতে পেরেছে? পত্র-পত্রিকা থেকে এ ধরনের কোন ধারণা পাওয়া যায় না। বরং সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে এ ধরনের অপরাধে নিষিদ্ধকৃত দলটির নেতা-কর্মীরা জড়িত থাকার কথা তেমন একটা শোনা যায় না।

অনেকে বলতে চেষ্টা করছেন যে তারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে তাই রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদেরকে কার্যক্রম চালাতে দেয়া হবে না। প্রশ্ন উঠছে যে বাংলাদেশে কি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নিষিদ্ধ? তাছাড়া এদেশে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কে করে না? যখন কেউ বলেন যে তার বিরোধী পক্ষকে ভোট দিলে দেশের মসজিদসমূহতে উলুধ্বনি দেয়া হবে, তখন কি ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয় না? যখন ধর্ম নিরপেক্ষতার পতাকাবাহী কেউ নির্বাচনের আগের সপ্তাহে নিজের মোনাজাতরত ছবির পোস্টারে সারা দেশে ছেয়ে ফেলেন তখন তাকে কি বলা যায়? কিংবা যখন কেউ কোরান শরীফের দোহাই দিয়ে তার দলের কর্মীদের নির্দেশ দেন যে তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ানো পুলিশ সদস্যদের ভাই,বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের চোখের বদলে চোখ ও হাতের বদলে হাতে আঘাত করতে হবে তখন তা কি ধর্ম নিয়ে রাজনীতির উগ্রতম রূপ নয়? রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এভাবে ধর্মকে দাঁড় করানো দেখে কি আব্দুর রহমান ও বাংলাভাইদের কথা মনে পড়ে না? আরেক ভদ্রলোক তো সর্বত্র বলে বেড়ান যে ধর্মে নারী নেতৃত্ব হারাম এবং তিনিই দেশের একমাত্র পুরুষ নেতা। তাছাড়া ধর্ম নিয়ে রাজনীতি যে আমাদের রাজনীতিকদের কথার কথা তা এতোদিনে সাধারণ জনগণের বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়। ড. কামালের মত ধর্ম নিরপেক্ষরা অবলীলাক্রমে মাজার ব্যবসায়ীদের সাথে জোট বাধছেন। এমনকি নিষিদ্ধকৃত দলটির মূলদলের সাথে একটি প্রধান একটি দল জোট বেঁধে ক্ষমতায় এসেছে এবং মন্ত্রী সভায় তাদের নেতারাও রয়েছেন। ধর্ম নিয়ে রাজনীতির অপর চিত্রটিও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এতোদিন আমেরিকার দৃষ্টি ছিল বিশ্ব শোষণের দিকে। দেশটির পররাষ্ট্র ও সমরনীতিতে ইহুদি লবীর যথেষ্ট প্রাধান্য থাকলেও সাধারণ

জনগণের মধ্যে পরধর্ম বিদ্বেষের প্রকাশ তেমন দেখা দেয় নি। ইউরোপের পরধর্মবিদ্বেষ এতোদিন ছিল নানা আবরণে আবৃত। ইসরাইল কিংবা ভারতের অবশ্য কোন রাকঢাক ছিল না। কিন্তু আমেরিকার শাসকবর্গ একটি ধর্মের অনুসারীদের বিরুদ্ধে নব্য ক্রুসেডের ডাক দিলে অবস্থা পাল্টে যায়। সেখানে ধর্মের সাথে সাথে পরধর্মবিদ্বেষের প্রকোপও তুঙ্গে ওঠে। সবকিছুকে খৃষ্টীয়করণের ক্ষেত্রে আমেরিকানরা যে কতদূর এগিয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মাইক্রোসফটের সাম্প্রতিক একটি পদক্ষেপে। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানী মাইক্রোসফট তার বিভিন্ন সফটওয়্যার পণ্যের বিপন্নন কর্মকর্তাদের পদবী রেখেছে Evangelist। যারা সভা সমাবেশ করে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে এবং অন্য ধর্মাম্বলম্বীদেরকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে বেড়ায় তাদেরকে Evangelist বলা হয়। ইউরোপের পরধর্ম সহিষ্ণুতার আবরণ খসে পড়েছে। একজন নারী তার পছন্দের পোষাক পরবেন তারা তা মানতে পারছে না। এমনকি নিজ মাটিতে নিজের ইচ্ছামত পোষাক পরার অধিকারও তারা দিতে নারাজ। বছরখানেক আগে আমাদের অর্থমন্ত্রীকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা জানতে চেয়েছিলেন যে আমাদের দেশের নারীরা বোরকা পরে কেন। আমেরিকা, ইউরোপ, ভারত ও ইসরাইলের পরধর্মবিদ্বেষী এই সব নেতাদের কাছে আমাদের দেশের রাজনীতিকদের একটি বড় অংশ বার বার নালিশ করে আসছেন যে বাংলাদেশে তাদের ধর্মশত্রু শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুতরাং তারা যেন তাদের এ সকল ধর্মশত্রু থেকে বাঁচতে উক্ত নেতাদের সমর্থন জানান। যখন সকলেই ধর্ম নিয়ে রাজনীতিতে লিপ্ত তখন এ অযুহাতে কাউকে নিষিদ্ধ করাটার বিষয়টি একটি খোঁড়া যুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

তাহলে কেন নিষিদ্ধকরণ? আমার একজন প্রতিবেশী, তিনি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বললেন, আসলে এরা ওদের ভয় পায়। কথাটা শুনে আমি হেসে ফেলেছিলাম। হরতালে যে নারী কর্মীদেরকে টিভিতে দেখা যায় তাদের কয়েকজনকে ছেড়ে দিলে নিষিদ্ধকৃত দলটির পুচকে ছেলেগুলো পালিয়ে বাঁচবে না। তাছাড়া যারা জীবন বাজী রেখে র‍্যাব-চিতার সাথে গোলাগুলি করে ডাকাতি-ছিনতাই করে বেড়ায় তারা ভয় পাবে! তিনি বললেন, এরা ওদেরকে ভয় পায় কেননা ওদের সাথে সংগঠন, শৃঙ্খলা ও সততায় পেরে উঠতে পারছে না। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, হত্যা, ধর্ষণ - এমন কিছু নেই যাতে এরা জড়িত নয়। ওদের বিরুদ্ধে এসব অপরাধের অভিযোগ পাওয়া যায় না। এদের সাংগঠনিক যোগ্যতা নেই, এরা নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা করে না এবং এরা নিজেরা নিজেরা এতো মারাত্মক রকমের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধায় যে তাতে হতাহতের ঘটনাও ঘটে। ওরা সুশৃঙ্খল, ওদের নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা রয়েছে, রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক নেতৃত্ব তৈরীর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং তাদের নিজেদের মধ্যে কোন কৌন্দল নেই। এদের কর্মীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি গড়ে তোলা বা তাদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার কোন উদ্যোগ নেই। ওরা কর্মীদের জন্য পাঠ্যতালিকা অনুসরণ করে এবং সে পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করার পরই একজন কর্মীর দলে পদোন্নতি ঘটে। নিজ কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ ছাত্রদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক করার জন্য তাদের নাকি রয়েছে নিজস্ব প্রকাশনা। এমনকি প্রযুক্তিতেও তারা নাকি পিছিয়ে নেই। কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখলাম সত্যিই প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর কোন ওয়েবসাইট নেই, অথচ তারা এক দশক আগেই ইন্টারনেটে তাদের স্থান করে নিয়েছে। তার মানে কি ছাত্রদের একটি দল তাদের সততা, বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা, যোগ্যতা, শৃঙ্খলা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও কর্মময়তা দিয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে আর অন্য কয়েকটি দল এ সকল ইতিবাচক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার ভয়ে তাদেরকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে?

বিষয়টি যদি সত্যি হয় তাহলে এটি অবশ্যই উদ্দিগ্ন হবার ব্যাপার। কেননা রাজনীতি একধরনের বাধ্যতামূলক সেবা যা জনগণ না চাইলেও তাদেরকে গ্রহণ করতে হয়। আমরা চাই বা না চাই আমাদের

দেশে মন্ত্রী-এমপি ও রাজনৈতিক দল থাকবে এবং তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। রাজনৈতিক নেতারা যত সৎ ও যোগ্য হবেন দেশের ততই মঙ্গল আর তারা যত অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য হবেন ততই জনগণের দুর্ভোগ বাড়বে। বিষয়টি এখন দেশের সুশীল সমাজ ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে বলেই সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের জন্য তাদের কেউ কেউ আন্দোলন শুরু করেছেন। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বিকাশের পূর্ব শর্ত হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনগুলোর জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ এবং পক্ষপাতমুক্ত মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও সাধারণ জনগণ। তা না হলে বিষয়টি দাড়াবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের সিডিকেটের মত। রাজনীতির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করার প্রবণতা থাকলে মাত্র কয়েকটি দল আমাদেরকে যে ধরনের নেতৃত্ব দেবে - তা চোর, ডাকাত যাই হোক না কেন, তা মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। অনেকে ভয় করছেন যে ওদেরকে প্রতিবন্ধকতাহীন ভাবে কাজ করতে দিলে তারা দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে অতিক্রম করে যাবে। গভীরভাবে চিন্তা করলে এ ধরনের ভয়ের বাস্তব ভিত্তি পাওয়া যায় না। বিষয়টি অনেকটা কোটা মুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের মত। সকলেই বলেছিলেন যে কোটা উঠে গেলে বাংলাদেশের পোষাক শিল্প গভীর সংকটে পড়বে। বাস্তবে তার উল্টোটা হয়েছে। কেননা সংশ্লিষ্টগণ বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করেছিলেন। প্রধান দুটি দলের পিছনে বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগের মত জনগণের সমর্থন রয়েছে। তারা যদি সত্যিই চায় যে তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোকে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরীর কারখানা হিসাবে গড়ে তুলতে তাহলে খুব সহজেই তা করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ কারো সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতায় পারবো না বলে তাকে নিষিদ্ধ করার মানসিকতা দেশের অন্যান্য সেক্টরে খারাপ প্রভাব ফেলে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্র, মিডিয়া ও প্রশাসনকে দিয়ে কাউকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের ছাত্রেরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক হবার জন্য পড়ালেখা করে না। তাদের প্রায় সকলেই পড়াশোনা শেষে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়। সেখানে তাদেরকে প্রতিযোগিতা করেই উপরে উঠতে হয়। তাছাড়া এখন প্রতিযোগিতা শুধু আমাদের নিজ দেশের মানুষদের মধ্যে নয়। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও দেশ হিসাবে আমাদেরকে নিয়ত বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও তাদের জনগণের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হচ্ছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়েও বেকার রয়েছে লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী। অথচ এ দেশেই প্রতিবেশী দেশের লক্ষাধিক নাগরিক উচ্চ পদে চাকুরী করছে। নিজ দেশের বাজারেই আমাদের পণ্যকে বিদেশের পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক বা বহু-পাক্ষিক সকল চুক্তিই শেষ পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। যারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন তারা যে সব সময় ঘুষ খেয়ে নিজ দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেন তা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর পিছনে কাজ করে আমাদের প্রতিনিধিদের দর কষাকষির ক্ষমতার অভাব যার কারণ মুক্ত প্রতিযোগিতায় আমাদের অনভ্যস্ততা।

তৃতীয়তঃ এ ধরনের নিষিদ্ধ করার অভ্যাস আমাদেরকে ধীরে ধীরে একটি অসহিষ্ণু ও বিবেক বর্জিত জাতিতে পরিণত করতে পারে। সহিষ্ণুতা ও বিবেক বোধ আমাদের সব থেকে বড় সম্পদ। এ দুটি গুণের জন্য আমরা জাতি হিসাবে বার বার ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছি এবং কোন ধরনের চরমপন্থা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থন পায় নি। এ কারণেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এই দেশটি এখনও প্রত্যক্ষ বিদেশী আগ্রাসন ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে। এখানে অসহিষ্ণুতার আবাদ সফল হলে তা জাতির জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর মাত্রারিক্ত নৈতিক অবনতির জন্যই দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবি করে আসছে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার নাগরিকেরা। সে দাবী পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কেননা, ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ছাত্র রাজনীতির বিকল্প নেই। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের মত সোনার পাথর বাটির জন্য অপেক্ষা না করে ছাত্র রাজনীতিকে সংশোধনের দিকে দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে। তার একটি ধাপ হবে অসহিষ্ণুতার চর্চা থেকে বিরত থেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।